سُورَةُ بَنِي إِسْرَآءِيلَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَاثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ
اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ① وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ
جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ②
ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ③
وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ④ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ⑥
اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۟ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ
فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ⑦

সূরা বনী ইসরাঈল
মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১১

পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত— যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি—যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (২) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী-ইসরাঈলের জন্যে হেদায়েতে পরিণত করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না। (৩) তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। (৪) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। (৫) অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (৭) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।— (জাস্সাস)

মাসআলা ঃ আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, যে অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণতঃ নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে হবে। খাদ্যশস্য বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্য শস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন—এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ —আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্যে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয়ঃ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা, তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে ঃ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ —অর্থাৎ, আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না– সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ, সবর করা আপনার জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ —এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। এক তাকওয়া ও ইহ্সান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহ্সানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ, যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

সূরা বনী-ইসরাঈল
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَسْرٰى শব্দটি اسراء ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায়

সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশে ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মে'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মে'রাজ সূরা নাজমে উল্লেখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بِعَبْدِهٖ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর হতে পারে না।

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মে'রাজের প্রমাণাদি ও ইমজা ঃ ইসরা ও মে'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। মে'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عبد শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মে'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশী মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মে'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয়

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে رؤيا (স্বপ্ন) বলে رؤيت (দেখা) বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একে رؤيا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رؤيا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رؤيا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মে'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে যে স্বপ্নযোগে মে'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মে'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। নামগুলো এই ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, আবু হাইয়্যা, আবু লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবু আইউব আনসারী, আবু উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)।

এরপর ইবনে-কাসীর বলেন فحديث الاسراء اجمع عليه المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মে'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে-কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে ঃ ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন ঃ সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সাঃ) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্যে ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। ইদানিং-কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাঁদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণতঃ ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আঃ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল-মুনতাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের 'রফরফ' দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মুরও দেখেন। বায়তুল-মামুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মামুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত ও দোযখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এ দ্বারা সব এবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের

সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামায আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাযও হতে পারে। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজটি প্রথমে সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্যে তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

মে'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য ঃ তফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে ঃ হাফেয আবু নায়ীম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কূযীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহ্ইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহ্ইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ্ বোখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবস্থা জানার জন্যে আরবের কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভৎসনা করবে। তখন আমার মনে মে'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বোঝে নেবেন। আমি বললাম ঃ আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলল ঃ নবুওয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার (বায়তুল-মোকাদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পন্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল ঃ আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল ঃ কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খন্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোন জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দরজাটি সম্ভবতঃ একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তবা আল্লাহ্র কোন প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।—(ইবনে-কাসীর, ৩য় খন্ড, ২৪ পৃঃ)

ইসরা ও মে'রাজের তারিখ ঃ ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হযরত খাদীজার ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহ্রী বলেন ঃ হযরত খাদীজার ওফাত নবুওয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, মে'রাজের ঘটনা নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন ঃ মে'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মে'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন ঃ ইসরা ও মে'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন ঃ নবুওয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দেসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭ তম রাত্রি মে'রাজের রাত্রি।

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা ঃ হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্টি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরয করলাম ঃ এরপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন ঃ এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্যে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ে নাও।—(মুসলিম)

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্র স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিস্তর

সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আঃ) নির্মাণ করেছেন।—(নাসায়ী, তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃঃ, ৪র্থ খন্ড)

বায়তুল্লাহ্‌র চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মেহানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত ঃ আয়াতে بَرَكْنَا حَوْلَهُ বলা হয়েছে। এখানে حول বলে সমগ্র সিরিয়াকে বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।—(রূহুল-মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ ঃ ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব।—(কুরতুবী) মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (১) মদীনার মসজিদ, (২) মক্কার মসজিদ, (৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে তূর।

ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা

প্রথম ঘটনা ঃ বর্তমান মসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটি হয়। বায়তুল-মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলেন মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ এর প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল-মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা ঃ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা ঃ এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নুমনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা ঃ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা ঃ হযরত ইসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না। কেননা, তার অনেকদিন পর কনষ্টানটাইন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লেখিত দু'টি ঘটনা কোন্‌গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ্ তাআলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্টপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ্ তাআলা সোলায়মান ইবনে দাউদের (আঃ) জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকূত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আঃ) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি আরয করলাম, এরপর বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন— বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহ্র নাফরমানী করে, গোনাহ্ ও কুকর্মে লিপ্ত হল এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল-মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতা ন'ছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী-ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবেলার জন্যে তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী-ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বোখতা নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ্ সেগুলোও বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর এবং গোনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا বলে একথাই বোঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তাআলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধন-সম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমানায় হযরত মাহ্দী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্রিত করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)

বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লেখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুইটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। (এক) মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং (দুই) ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লেখিত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

উল্লেখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা ছিল এই ঃ তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না ; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী-ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কোরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আঃ)-এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যের পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে বনী-ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের দেশ, ধন-সম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝
وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝
وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝
وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ
وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ
طٰۗىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۝
اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا
يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝ وَاِذَآ اَرَدْنَآ
اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ۝ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ
بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ۝

(৮) হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি। (৯) এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। (১০) এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয় (১২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নির্দশন করেছি। অতঃপর নিষ্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নির্দশন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কেয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। (১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্ভুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই। (১৭) নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا —অর্থাৎ, তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মূসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার ঈসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে মুহাম্মদীয় যুগ যা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিতেই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনঃনির্মাণ করেন এবং পয়গম্বরগণের এ কেবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী-ইসরাঈলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ। বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ ঃ বনী-ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ এই যে, মুসলমানগণ এ খোদায়ী বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদও আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঃ আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠে এবাদতের জন্যে দু'টি স্থানকে এবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল-মোকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্র আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানের খ্রীষ্টান বাদশাহ্ বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস করার উদ্দেশে অভিযান করলে আল্লাহ্ তাআলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল-মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফের আল্লাহ্র বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় ঃ উল্লেখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারীরা যখন ফেৎনা

ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কোরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে عبادنا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্র দিকে কোন বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্যে পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ এর অধীনে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মে'রাজে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু عبده(দাস) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে দাস বলে আখ্যায়িত করা। বনী-ইসরাঈলকে শাস্তি দেয়ার জন্যে যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে عبادنا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে اضافت তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عِبَادًا لَّنَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবমণ্ডলীই আল্লাহ্র বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের اضافت তথা সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে হতে পারে।

'আকওয়াম' পথ ঃ কোরআন পাক যে পথনির্দেশ করে, তাকে 'আকওয়াম' বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।— (কুরতুবী) এ থেকে বোঝা গেল যে, কোরআন পাক মানব জীবনের জন্যে যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল মনে করতে থাকে ; কিন্তু রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন্ কাজে ও কিভাবে বেশী। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভালমন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না।

সম্ভবতঃ এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্যে এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ্ তাআলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে তা নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্যে ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণামদর্শিতায় ভুল করে; তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে,

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় 'ইনসান' শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্বভাবযুক্তদের বুঝতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্যে উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) দিনের আলোতে মানুষ রুযী অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরী, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্যে আলো অত্যাবশ্যক। (দুই) দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণতঃ ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরী, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ ঃ মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয়। কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবু উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন কোন কোন লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরয করবে ঃ পরওয়ারদেগার ! এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে ঃ আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতে।— (মাযহারী)

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়ার ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতদৃষ্টে কোন কোন ফেকাহ্বিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি-সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহ্র কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন; রসূল ও নবী অথবা তাদের

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ
وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ
اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا
كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ
فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ
وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ
الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ
رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

(১৮) যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (২০) এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত। (২১) দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম। (২২) স্থির করো না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। (২৪) তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল ঃ হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (২৫) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। (২৬) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। (২৯) তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।

কোন প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল বটে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফেরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, পিতা-মাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। অবশ্য এ প্রশ্নে ফেকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ وَاِذَآ اَرَدْنَآ এবং اَمَرْنَا অতঃপর বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ্ তাআলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি তরজমায়ও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরী ও গোনাহের সংকল্প – আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ঃ আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক-শ্রেণীর চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ ... যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশেই আচ্ছন্ন করে রাখে-পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় اَرَادَ الْاٰخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মুমিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফের বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হল মুমিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেদআত ও মনগড়া আমল যতই ভাল দেখা যাক-- গ্রহণযোগ্য নয় ঃ এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سَعْيُهَا শব্দযোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়—সাধারণ বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যতঃ যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন—পরকালের জন্যে উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তফসীর রূহুল মা'আনী سَعْيُهَا শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে একথাও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ, সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলা ভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল না— এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের এবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন, সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ, আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজেব। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ (মুস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল ঃ এরপর কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।—(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফযীলত ঃ মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাক হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (১) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও (মাযহারী) (২) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

(৩) হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন ঃ তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবী ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

(৪) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে, তার জন্যে জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল,তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিন বার বলেনঃ যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবাযত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্বের সওয়াব পায়। লোকেরা আরয করল ঃ সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্। তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই।

পিতা-মাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় ঃ (৬) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমানে আবু বকরা (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কেয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তফসীরে-মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।)

কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে ঃ এ ব্যাপারে আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণ একমত যে, পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহ্‌র কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েযও নয় । হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়।

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরী নয় ঃ ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বোখারী থেকে হযরত আসমার (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন ঃ صلى أمك অর্থাৎ, "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাক বলে ঃ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে মারূফ' বলে তাদের সাথে

আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে।

মাসআলা ঃ যে পর্যন্ত জেহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্যে জেহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জেহাদের অনুমতি নেয়ার জন্যে উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল ঃ জ্বী হাঁ, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ

তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জেহাদ কর। অর্থাৎ, তাঁদের সেবাযত্নের মাধ্যমেই তুমি জেহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লেখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল ঃ আমি পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রসূলুল্লাম্ (সাঃ) বললেন ঃ যাও, তাঁদের হাসাও; যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ, তাঁদেরকে গিয়ে বল ঃ এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেহাদে যাব না।— (কুরতুবী)

মাসআলা ঃ এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে-আইন না হলে এবং ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয পরিমাণ দ্বীনী জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলেম হওয়ার জন্যে সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবু উসায়দ বদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! পিতা-মাতার এন্তেকালের পরও তাদের কোন হক আমার যিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ তাদের জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজার (রাঃ) ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজার (রাঃ) হক আদায় করা।

পিতা-মাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত ঃ বার্ধক্যে ঃ পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজেব ও ফরয কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশে কোরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্যে অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের সাধারণ নীতি।

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়তঃ বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোরআন পাক এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতা-মাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

(এক) তাঁদেরকে 'উহ্'-ও বলবে না। এখানে 'উহ্' শব্দটি বলে এমন শব্দ বোঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উহ্' বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয়, وَلَا تَنْهَرْهُمَا - نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন ঃ যেমন কোন গোলাম তার রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ ঃ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جناح শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতা-মাতার জন্যে নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমতঃ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়, বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতা-মাতার সামনে নম্র ও হেয় পেশ হওয়া সত্যিকার ইয্যতের পটভূমি। কেননা, এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ

মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করা যাবেই, কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়।

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লেখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্যে জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্যে তওবা করলে আল্লাহ্ তাআলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্যে বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। اوابين শব্দের অর্থ توابين অর্থাৎ, তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিব ছয় রাকআত এবং ইশরাকের নফল নামাযকে صلوٰة الاوابين বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাযগুলো পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা اوابين অর্থাৎ, توابين (তওবাকারী)।

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতা-মাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেনঃ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ— এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবনধারণের মত ধন-সম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরয। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাক্বারার আয়াত وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়। – (তফসীর-মাযহারী)

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার যিম্মায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র; কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تبذير অর্থাৎ, অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تبذير এবং অপরটি اسراف আলোচ্য আয়াতে تبذير নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوا আয়াতে اسراف নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহ্র কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير ও اسراف বলা হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ গোনাহ্র কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে اسراف বলা হয়। তাই تبذير اسراف এর চাইতে গুরুতর। تبذير কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্যে ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক 'মুদ'ও (অর্ধ সের) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয়। একে اسراف ও বলে। এটা হারাম।— (কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تبذير এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়— এটাও تبذير এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা تبذير এর অন্তর্ভুক্ত নয়।— (কুরতুবী)

২৮ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্যে অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অর্থ কড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মনসুর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লেখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু

লোক আসলে তাদেরকে দেয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ ঃ ২৯ নং আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে–নুযূলে ইবনে মারদওয়াইয়াহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমার আম্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন ঃ অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল ঃ আম্মা বলছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাজের সময় হল। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভিতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্র পথে বেশী ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর ঃ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্যে অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরআন পাকের مَحْسُورًا শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্যে মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্যে এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকল্যের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আমলে স্বীয় ধন–সম্পদ নিঃশেষে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোন কিছুই করেননি। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্যে, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভাল হত' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ ঃ আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃংখলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে, তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার–পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়াও বিশৃংখলা। (মাযহারী) مَلُومًا مَحْسُورًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, ملوم শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ,কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। محسور শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী ব্যয় করে নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে مَحْسُورًا অর্থাৎ, শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده
خبيرا بصيرا ﴿٣٠﴾ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم
وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ﴿٣١﴾ ولا تقربوا الزنى إنه كان
فاحشة وساء سبيلا ﴿٣٢﴾ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
في القتل إنه كان منصورا ﴿٣٣﴾ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي
هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان
مسئولا ﴿٣٤﴾ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم
ذلك خير وأحسن تأويلا ﴿٣٥﴾ ولا تقف ما ليس لك به علم إن
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ﴿٣٦﴾ ولا
تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال
طولا ﴿٣٧﴾ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ﴿٣٨﴾ ذلك مما
أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر
فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ﴿٣٩﴾ أفأصفاكم ربكم بالبنين و
اتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ﴿٤٠﴾

(৩০) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,—সব কিছু দেখছেন। (৩১) দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। (৩২) আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (৩৩) সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। (৩৪) আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। (৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবরে মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। (৩৯) এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর গর্হিত কথাবার্তা বলছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ৩১ আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ انما تنصرون وترزقون بضعفائكم অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়।

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে اذا فاتك الحياء فافعل ماشئت অর্থাৎ, তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন ঃ الحياء شعبة من الايمان (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী, যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত

যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে।— (বাযযার)

হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মুমিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী, ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে।— (মাযহারী)

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্র কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু অপরাধ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এতদসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তাআলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।— (ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা ও হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে অর্থাৎ, এই লোকটিকে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে।— (মাযহারী, ইবনে মাজাহ্ হইতে)

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়ার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক গোনাহ্ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে মুসলমান আল্লাহ্ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কেসাস নেয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও একদিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী।

فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ এটা ইসলামী আইনের একটা বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া জায়েয নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমা লঙ্ঘন করে, তবে সে মযলুমের পরিবর্তে জালেমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালেম মযলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণতঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। ইসলামী কেসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম। তাই فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প ঃ একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের সর্বাধিক জালেম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোন সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ্ তাআলা জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোন জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে না। আল্লাহ্ তাআলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে কোন অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্যে অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হবে।

এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা ঃ প্রথম আয়াতে এতীমদের মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, এতে যেন শরীয়তবিরোধী অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাযত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনর বৎসর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বৎসর।

অবৈধ পন্থায় যে কোন ব্যক্তি মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে

মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ্ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। (এক) যা বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে—দুনিয়াতে সে মুমিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মুমিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহ্ বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোন এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লেখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপিত করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায় ; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হাঁ, শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গোনাহগার হবে। হাদীসে একে কার্যতঃ নিফাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا – অর্থাৎ কেয়ামতে অন্যায় ফরয, ওয়াজিব কর্ম এবং খোদায়ী বিধানাবলী পালন করা বা না করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যস্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফফিফীনে উল্লেখিত আছে।

মাসআলা ঃ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা ঃ মাসআলা وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ —তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন ঃ এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্যে বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا —এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দু'টি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ, এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভাল মনে করতে পারে না। (দুই) এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا —এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে ঃ কানকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে ঃ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়তবিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে ; যেমন কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে ; যেমন বেগানা স্ত্রীলোক বা স্ত্রী সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুন্নাহ্‌বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ করতে হবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নেয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ —অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণতঃ কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্যে অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, আজ (কেয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবতঃ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যেই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহ্র এই নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে— কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যদ্দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লেখিত হয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দু'টি ইন্দ্রিয় একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশী। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

৩৭ নং আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই ঃ ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ, এমন ভঙ্গিতে চলো না, যদ্দ্বারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহ্র সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ্। মানুষের ব্যবহার ও চলাচলের যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুলোও অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে।—(মাযহারী)

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا —অর্থাৎ উল্লেখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহ্র কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে ; যেমন পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা ; অর্থাৎ, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

হুশিয়ারী ঃ পূর্বোল্লেখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا —এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়, বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহ্র হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার সংক্ষেপ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে।—(মাযহারী)

(৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বলুন ঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছার পথ অন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু উর্ধ্বে (৪৪) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (৪৫) যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখনও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে যখন জালেমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) দেখুন, ওরা আপনার জন্যে কেমন উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব, ওরা পথ পেতে পারে না। (৪৯) তারা বলে ঃ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৫০) বলুন ঃ তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবে ঃ আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে। বলুন ঃ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে ঃ এটা কবে হবে? বলুন ঃ হবে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذًا لَّابْتَغَوْا আয়াতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ্ না হন; বরং তাঁর খোদায়ীতে অন্যরাও শরীক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কালাম শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

যমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ ঃ ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জ্বিনদের তসবীহ্ পাঠ করার বিষয়টি জাজ্জ্বল্যমান–সবারই জানা। কাফের মানব ও জ্বিন বাহ্যতঃ তসবীহ্ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্য বস্তু, যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ কি? কোন কোন আলেম বলেন ঃ তাদের তসবীহ্ পাঠের অর্থ অবস্থাগত তসবীহ্। অর্থাৎ, তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোন বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তসবীহ্।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তসবীহ্ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জ্বিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তাআলা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তসবীহ্ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফেররাও সাধারণভাবে আল্লাহ্কে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহ্যতঃ আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অ:শও বাধ্যতামূলক ভাবে আল্লাহ্র তসবীহ পাঠ করছে; যেমন– বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তসবীহ্ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কোরআন পাকের وَلٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত তসবীহ্ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তসবীহ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তসবীহ্ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়, সত্যিকারের; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে।– (কুরতুবী)

হাদীসে একটি মু'জেযা উল্লেখিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর হাতের তালুতে কঙ্করের তসবীহ পাঠ সাহাবায়ে কেরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে মু'জেযা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'খাসায়েসে–কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ কঙ্করসমূহের তসবীহ পাঠ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মু'জেযা নয়। তারা তো যেখানে থাকে সেখানেই তসবীহ্ পাঠ করে; বরং মু'জেযা এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ্ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কোরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি–প্রমাণ পেশ করেছেন।

উদাহরণতঃ সূরা সাদে হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ —অর্থাৎ, আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল তসবীহ্ পাঠ করে। সূরা বাক্বারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ অর্থাৎ, কতক পাথর আল্লাহ্র ভয়ে নীচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহ্র ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে ঃ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا অর্থাৎ এরা আল্লাহ্র জন্যে পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফরী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলাবাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ্কে স্মরণ করে-এমন কোন বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হাঁ বলে, তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا অতঃপর বলেন ঃ এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হল যে, পাহাড় কুফরী বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহ্র যিকর শোনে না এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন জ্বিন, মানব, পাথর ও টিলা এমন নেই, যে মুয়াযযিনের আওয়ায শুনে কেয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দিবে।- (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ইবনে মাজা)

পয়গম্বরের উপর যাদুর ক্রিয়া হতে পারে ঃ পয়গম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জ্বিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে যে, যাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআন তা'ই খণ্ডন করেছে। অতএব যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে নুযুল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেনঃ কোরআনে যখন সূরা লাহাব নাযিল হয়, যাতে আবু লাহাবের স্ত্রীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বললেন ঃ আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন ঃ না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবু বকরকে সম্বোধন করে বলতে লাগল ঃ আপনার সঙ্গী আমার "হিজু" (কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে একথা বলতে বলতে প্রস্থান করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম। তাঁর প্রস্থানের পর হযরত আবু বকর আরয করলেন ঃ সে কি আপনাকে দেখেনি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল ঃ হযরত কা'ব বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাঁকে দেখতে পেত না। আয়াতত্রয় এই ঃ এক আয়াত—সূরা কাহ্ফের وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا দ্বিতীয় আয়াত সূরা নাহলের أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ এবং তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিয়ার أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً হযরত কা'ব বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশতঃ রোম দেশে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন সংকট মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে। তিনি কালবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে যায়। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলাফেরা করছিল; কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা'লাবী বলেন ঃ হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি 'রায়' অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফেররা তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদ থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান; অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের ঐ আয়াতগুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান; বরং তাদের মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করতে করতে যান; কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই ঃ

يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ
فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ
بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ
إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم
مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِن
مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ
بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ
أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۗ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَ
الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

(৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিলে। (৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমাদের প্রতি রহমত করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আমি আপনাকে ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। (৫৫) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি। (৫৬) বলুন ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহবান কর। অথচ ওরা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (৫৭) যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ। (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কেয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (৫৯) পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্যে সামূদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশেই নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি। (৬০) এবং স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়।

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরূপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অশ্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে "লোকটি কোন শয়তান হবে" বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গেল। বলাবাহুল্য তারা, আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ – دعاء শব্দটি يدعو থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়ায দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে আওয়ায দেয়াও সম্ভবপর।— (কুরতুবী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভাল নাম রাখবে। (অর্থহীন নাম রাখবে না।)

হাশরে কাফেররাও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবেঃ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ – استجابت শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়ায অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে। بِحَمْدِهِ অর্থাৎ, ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মুমিন ও কাফের সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা, আয়াতে প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। তফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেন ঃ কাফেররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سبحانك وبحمدك বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোন উপকারে আসবে না —(কুরতুবী) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মুমিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফেরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে ঃ يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا হায় আফসোস ! কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে يٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ হায় আফসোস ! আমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে উঠবে। পরে কাফেরদেরকে মুমিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া হবে; যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফেরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলী উচ্চারিত হবে। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হাম্‌দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্‌দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হামদের মাধ্যমে হবে। যেমন- বলা হয়েছে, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্যে।

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েয নয় ঃ ৫৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটু কথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন, ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا —এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যবুর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ বর্তমান প্রচলিত যবুরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।— (তফসীরে হক্কানী)

ইমাম বগভী স্বীয় তফসীরে এ স্থানে লেখেন ঃ যবুর আল্লাহর গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশ পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হামদ ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরয কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ — وسيلة শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারও কাছে পৌঁছার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্‌র জন্যে ওসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহ্‌র মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসরণ করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা-মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।— (কুরতুবী)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ, শবে-মে'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্যে একটি ফেতনা ছিল। আরবী ভাষায় 'ফেতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ গোমরাহী। আরিফ অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়েশা, সুফিয়ান, হাসান, মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেন ঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফেতনা। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন শবে-মে'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপক্ক নও মুসলিম এ কথা মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল।— (কুরতুবী)

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, رؤيا শব্দটি আরবী ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্‌সা বোঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে; বরং এখানে رؤيا শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরবিদ মে'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। একারণেই অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ মে'রাজের ঘটনাকে আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন।— (কুরতুবী)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ قَالَ
ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ
عَلَيَّ لَىِٕنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا
قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاۗؤُكُمْ
جَزَاۗءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ
وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۭ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾ اِنَّ عِبَادِيْ
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾ رَبُّكُمُ الَّذِيْ
يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ
اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٨﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ
يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ
الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٦٩﴾

(৬১) স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল : আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (৬২) সে বলল : দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। (৬৩) আল্লাহ্ বলেন : চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি –ভরপুর শাস্তি। (৬৪) তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৫) আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী। (৬৬) তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্যে কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্যে মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَاَحْتَنِكَنَّ – احتناك শব্দের অর্থ কোন বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। وَاسْتَفْزِزْ – استفزز শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো হয়েছে। بِصَوْتِكَ – صوت শব্দের অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং- তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম।—(কুরতুবী)

ইবলীস হযরত আদমকে (আঃ) সেজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। (এক) আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নির দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই একথা বলাই বাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এর উত্তরে বলেছেন : আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ, জাহান্নামের আযাবে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতের وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতেকরে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত হয় না; বরং এই বাকপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবতঃ সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও অবান্তর নয়।

وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ –মানুষের ধন-সম্পদ ও সন্তান-

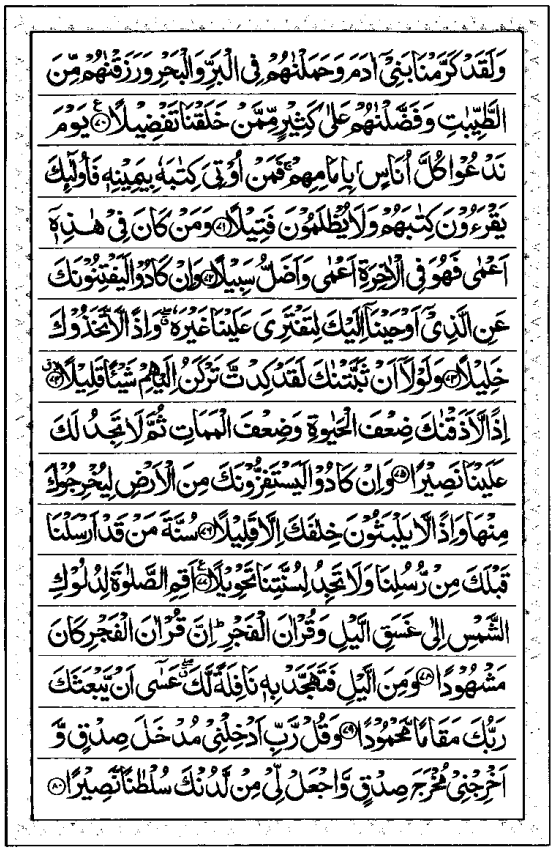

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝٧٠ يَوْمَ
نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ
يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝٧١ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ
اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝٧٢ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ
عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ
خَلِيْلًا ۝٧٣ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝٧٤
اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝٧٥ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ
مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٧٦ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا
قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝٧٧ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ
الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُوْدًا ۝٧٨ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝٧٩ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ
اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝٨٠

(৭০) নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (৭১) স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহবান করব, অতঃপর যাদেরকে ডানহাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না। (৭২) যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত। (৭৩) তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে আপনার পদস্খলন ঘটানোর জন্যে তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সম্বন্ধযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। (৭৪) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়া যায়। তখন তারাও আপনার পর সেখানে অল্পকালই মাত্র টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না। (৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (৭৯) রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। (৮০) বলুন ঃ হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এই যে, ধন-সম্পদ অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধন-সম্পদে শয়তানের শরীকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েকভাবে হতে পারে ঃ সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে, তাদের লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? ঃ ৭০ নং আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। (এক) এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? (দুই) অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আদম-সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণতঃ সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উর্ধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পৌঁছানো — এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোন কোন আলেম বলেন ঃ হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার করে। কেউ কাঁচা গোশত, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীব-জন্তুর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ্ তাআলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্ধ্বে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠ করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উর্ধ্ব ও অধঃজগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীব-জন্তুর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জ্বিন জাতির

চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী; যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণতঃ ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ ফেরেশতা; যেমন — জিবরাঈল, মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ সৎকর্মী মুমিনের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণীর মুমিন — যেমন পয়গম্বর শ্রেণী, তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলাবাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য, সাফল্য ও যুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা এই ঃ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়; বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত। — (মাযহারী)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ —এখানে امام শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ এখানে إِمَامٍ مُبِينٍ অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়।- (কুরতুবী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

قال : يدعى احدهم فيعطى كتابه بيمينه

অর্থাৎ, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ আয়াতের তফসীরে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে।

এ হাদীস থেকে নির্ণীত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ অর্থ আমলানামা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে-এই নেতা পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েব, মাশায়েখ এবং ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা হোক।— (কুরতুবী)

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণতঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী দল, মূসা (আঃ)-এর অনুসারী দল, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেয়াও সম্ভবপর।

আমলনামাঃ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাফেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ অন্য এক আয়াতে রয়েছে— إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ —প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডান হাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেয়া হবে, পরহেযগার হোক কিংবা গোনাহ্‌গার। তারা আনন্দচিত্তে আমলনামা পাঠ করবে, বরং অন্যদেরকেও পাঠ করত দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তির হবে যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্যে তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বাম হাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোন কোন হাদীসে تطاير الكتب শব্দটি উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোন কোন হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দেবে কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে।— (বয়ানুল-কোরআন)

إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ অর্থাৎ, যদি অসম্ভবকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বি গুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বি গুন হত। কেননা, নৈকট্যশীলদের মামুলী ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্নীদের সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

অর্থাৎ, হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ — استفزاز—এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশী দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ হে আবুল কাসেম (সাঃ), যদি আপনি নবুওয়তের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেননা, সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গম্বরের বাসভূমি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ আয়াতটি নাযিল করে, তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। যা সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

–কে মক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফেরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশীদিন সুখে–শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসেবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কোরআন পাকের এই হুশিয়ারীও মক্কার কাফেররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কাওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়–ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরী অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমগ্র মক্কা মোকাররমা জয় করে নেন।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا —এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপই চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি তাদের পয়গম্বরকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়।

শত্রুদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামায ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে নামায কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ

অর্থাৎ, আমি জানি যে, কাফেরদের পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদা কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।— (কুরতুবী)

এ আয়াতে আল্লাহ্র যিকর, প্রশংসা, তসবীহ্ ও নামাযে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্র যিকর ও নামায বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখাও অবান্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্র সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামায। যেমন কোরআন পাক বলে ঃ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ, সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ ঃ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, دلوك শব্দের অর্থ আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয়, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دلوك বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এস্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন।— (কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাসীর)

اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ – غَسَقٌ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। ইমাম মালেক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ এর মধ্যে চারটি নামায এসে গেছে ঃ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু'নামাযের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غسق ليل অর্থাৎ, অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তমিত হয়ে যায়। বলা–বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অস্তমিত হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একেই غَسَقِ الَّيْلِ এর তফসীর স্থির করেছেন।

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ এখানে قُرْاٰنَ শব্দ বলে নামায বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে–কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাযের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كَانَ مَشْهُوْدًا – شهادة ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ উপস্থিত হওয়া। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা–রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাযে উপস্থিত হয়। তাই একে مشهود বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামায আদায়ই করতে পারে না। জানি না, যারা কোরআনকে হাদীস ও রসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে, তারা নামায কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কেরাআত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কেরাআত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাআতের কথাও কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তা কার্যতঃ পরিত্যক্ত। সহীহ্ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ, মুরসালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাযে শুধু 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ

মাগরিবে দীর্ঘ কেরাআত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাআতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ – تهجد শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা, بِهٖ —এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। (মাযহারী) কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ কারণেই শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাযকে "নামাযে তাহাজ্জুদ" বলা হয়। সাধারণতঃ এর অর্থ, এরূপ নেয়া হয় যেকিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু তফসীর মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশে নামায পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামায পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের জন্যে নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্যে প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর লেখেনঃ

قال الحسن البصرى هو ماكان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم অর্থাৎ, হযরত হাসান বসরী বলেনঃ এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কোরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু সাধারণতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদ ফরয না নফল? ঃ نَافِلَةً لَّكَ – نفل শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব নামায, সদকা–খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরী নয় — করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে نَافِلَةً لَّكَ শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর জন্যে নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যেও নফল। এজন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে نَافِلَةً শব্দটিকে فريضة —এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ উম্মতের ওপর তো শুধু পাঞ্জেগানা নামাযই ফরয; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব, এখানে نَافِلَةً শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ফরয — নফলের সাধারণ অর্থে নয়।

এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযযাম্মেল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবা উপর ফরয ছিল। সূরা মুযযাম্মেলে —এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে–মে'রাজে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামায সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পক্ষেও রহিত হয় কিনা, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের نَافِلَةً لَّكَ বাক্যের অর্থ তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামায রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। (এক) ফরযকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোন প্রকৃত অর্থ নেই। (দুই) সহীহ্ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে –মে'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে; কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ — অর্থাৎ, আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই দেয়া হবে; যদিও কাজ হাল্কা করে দেয়া হয়েছে।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উপর পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া কোন নামায ফরয ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, نَافِلَةً শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরযের অর্থে হত, তবে এরপরে لك শব্দের পরিবর্তে عليك হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। لك তো শুধু জায়েয হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের ফরয নামায যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্যে নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে نَافِلَةً لَّكَ বলার কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যেই নফল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল এবাদত তাদের গোনাহের কাফফারা এবং ফরয নামাযসমূহের ত্রুটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গোনাহ্ থেকে এবং ফরয নামাযের ত্রুটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল এবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল এবাদত কোন ত্রুটি পূরণের জন্যে নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়। –(কুরতুবী, মাযহারী)

"মাকামে মাহমুদ" ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –কে মাকামে মাহমুদের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এই মাকাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট — অন্য কোন পয়গম্বরের জন্যে নয়। এর তফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওযর পেশ করবেন। একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্যে শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর ও তফসীরে মাযহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত সমূহের বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদ নামাযের বিশেষ প্রভাব ঃ হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-সানী (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; অতঃপর মাকামে মাহমুদ অর্থাৎ, শাফাআতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফেরদের উৎপীড়ন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মোকাবিলায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা নামায কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গম্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ ''মাকামে মাহমুদ'' দান করার ওয়াদা করা হয়েছে; এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُلْ رَّبِّ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইহকালেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাফেরদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়ার কৌশল মদীনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ —আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ — এখানে **مدخل ও مخرج** — এর অর্থ প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে **صدق** বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা, আরবী ভাষায় **صدق** এমন কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়, যা ব্যহ্যতঃ ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোরআন পাকে **لسان صدق قدم صدق ও مقعد صدق** শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদীনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্, মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ী-ঘরের মহব্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাতাদা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তফসীর আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল না; বরং বায়তুল্লাহ্কে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদীনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল তাই লক্ষ্যবস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্যে মকবুল দোয়া ঃ হিজরতের সময় আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদীনায় পৌছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেরদের কবল থেকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং মদীনাকে বাহ্যতঃ ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্যে ও মুসলমানদের জন্যে উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোন আলেম বলেন ঃ এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا — এ দোয়ারই পরিশিষ্ট। হযরত কাতাদাহ্ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ
الظّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا
بِجَانِبِهٖ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى
شَاكِلَتِهٖ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدٰى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ وَيَسْـَٔلُونَكَ
عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهٗ
كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى
أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِن
كُلِّ مَثَلٍ ۖ فَأَبٰٓى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ
حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن
نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ
كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

(৮১) বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (৮৩) আমি মানুষকে নেয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়; যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন ঃ প্রত্যেকই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। (৮৫) তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন ঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (৮৬) আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্যে তা আনয়নের ব্যাপারে আমার মোকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৮৭) এ প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকর্তার মেহেরবানী। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর করুণা বিরাট। (৮৮) বলুন ঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (৮৯) আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি। (৯০) এবং তারা বলে ঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। (৯১) অথবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, (৯২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ —এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্শ্বে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলেম বলেন ঃ বছরের প্রত্যেক দিনের জন্যে মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সেখানে পৌঁছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল, جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন।—(বোখারী, মুসলিম)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, ঐ ছড়ির নীচ দিকে রাংতা অথবা লোহার রজত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মূর্তিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন। —(কুরতুবী)

শেরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গোনাহ্‌র কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেয়াও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযের বলেন ঃ কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রঙ-বেরঙের চিত্র অঙ্কিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আঃ) যখন শেষ যমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী খ্রীষ্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ —কোরআন পাক যে অন্তরের ঔষধ এবং শেরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কোন কোন আলেমের মতে কোরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কোরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দেয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর এই হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে বিচ্ছু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনারা এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েয বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর 'কুল আউযু' শীর্ষক সূরাসমূহ পাঠ করে ফুঁ দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কোরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

وَلَا يَزِيدُ الظّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا — এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন কোরআন দ্বারা রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে, তেমনি অবিশ্বাস এবং কোরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি এবং বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ এখানে شاكلة শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম পরিবেশ। অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। — (কুরতুবী) এতে মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎলোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। —(জাসসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এস্থলে شاكلة —এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নযীর ঃ

اَلْخَبِيثٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِينَ — অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্ট পুরুষদের জন্যে এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্যে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

আলোচ্য ৮৫ আয়াতে রূহ্ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লেখিত হয়েছে। রূহ্ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কোরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই, যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ —প্রাণ যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কোরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلٰى قَلْبِكَ — এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্যেও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং কোরআনও ওহীকে রূহ্ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন—

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

রূহ্ বলে কি বোঝানো হয়েছে ঃ এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন্ অর্থের দিক দিয়ে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কোরআন অথবা ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ — এ কোরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কোরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ বলে ওহী, কোরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কোরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ্ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ, রূহ্ কি? মানবদেহে রূহ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) আগমন করছেন। তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন ঃ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ বলাবাহুল্য, কোরআন অথবা ওহীকে রূহ বলা কোরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেয়া খুবই অবান্তর। তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ জন্যেই ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর, কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত, রূহুল মা'আনী প্রমুখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কোরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ; কাজেই বেখাপ্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযুল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রিসালত পরীক্ষা করা।

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করত। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেয়া দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। তদনুসারে কোরায়শরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। —(ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেই এক আয়াতের তফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে, রূহকে কিভাবে আযাব দেয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। -(ইবনে কাসীর)

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল না মদীনায়? ঃ এ আয়াতে শানে নুযুল

সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতটিকে 'মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই ইবনে কাসীর এ সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি মদীনায় পুনর্বার নাযিল হয়েছে; যেমন কোরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তফসীরে মাযহারী ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্ন মদীনায় এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাযহারী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছে। (এক) এ রেওয়ায়েতটি বোখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। (দুই) এতে বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যতঃ এটাই বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন।

উল্লেখিত প্রশ্নের জওয়াব ঃ প্রশ্নের উত্তরে কোরআন বলেছে ঃ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথীর উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জওয়াবে তা বলা হয়নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন ঃ রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, রূহ্ সাধারণ সৃষ্টজীবের মত উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি ; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে, রূহ্‌কে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ্ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্যে যথেষ্ট। এর বেশী জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেয়া হয়নি; বিশেষতঃ যেক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ — পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশীই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই । তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَئِنْ شِئْنَا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গীর নয়। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারে। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত। বিশেষতঃ যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়; বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ — এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবী করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম স্বীকার না কর; বরং কোন মানবরচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানব; এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জ্বিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবতঃ এ কারণে যে, তোমরা আমার রসূলকে নবুওয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্যে রূহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কোরআনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুওয়ত ও রিসালত সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জ্বিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্‌র কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কোরআনের খোদায়ী কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সর্বশেষ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا —আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের মু'জেযা এতটুকু জাজ্জ্বল্যমান যে, এরপর কোন প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকর করে না এবং কোরআনরূপী নেয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে।

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَن نُّؤْمِنَ
لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ
كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾ قُل لَّوْ كَانَ فِي
الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن
يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ
زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ
أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ فَأَبَى الظَّالِمُونَ
إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا
لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

(৯৩) অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব। বলুন ঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? (৯৪) 'আল্লাহ্ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন' ? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হেদায়েত। (৯৫) বলুন ঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গম্বর করে প্রেরণ করতাম। (৯৬) বলুন ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (৯৭) আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সে ই তো সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্যে আপনি আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে ঃ আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৯৯) তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ্ আসমান ও যমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্যে স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল, এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর জালেমরা অস্বীকার ছাড়া কিছু করেনি। (১০০) বলুন ঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অসামঞ্জস প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসেবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে মানুষ স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, সংস্কারকদের জন্যে চিরস্মরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়নি এবং হঠকারিতাপূর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রূপাত্মক বাক্যও উচ্চারণ করা হয়নি; বরং সাধাসিধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহ্র রসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের কাজ শুধু আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছানো। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রেসালত সপ্রমাণ করার জন্যে অনেক মু'জেযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ্ তাআলাই তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

মানবের রসূল মানবই হতে পারেন ঃ সাধারণ কাফের ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহ্র রসূল হতে পারে না। কেননা, সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের উপর তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের এ ধারণার জওয়াব কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেয়া হয়েছে। এখানে وَمَا مَنَعَ النَّاسَ আয়াতে যে জওয়াব দেয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরোক্তরূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই করত না। সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহ্র রসূল মানব জাতির মধ্য থেকে হন। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতাসুলভ শানেরও অধিকারী হবেন– যাতে সাধারণ মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌঁছাতে পারেন।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রসূল মানব হওয়া

সত্ত্বেও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরূপে লাভ করতে পারবে?

প্রশ্ন হয় যে, রসূল ও উম্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জ্বিন জাতির রসূল নিযুক্ত হলেন কিরূপে? জ্বিন তো মানবের সমজাতি নয়। উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নন; বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদারও অধিকারী। এ কারণে তাঁর সাথে জ্বিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবী কর যে, তোমাদের রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবী অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত; তবে ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করার প্রয়োজন তখনই হত, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত; বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে: যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রহমতের ভান্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ্‌র রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ 'পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফেররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মত সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা করে দিন। এর জওয়াব পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। আমি তো একজন রসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য-শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রেসালত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্যে কোরআনের অলৌকিকতার মু'জেযাটি যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হয়, তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ড তোমাদেরকে সবকিছু দেয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেয়া হয়, তবে এর পরিণামেও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হবে না; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটিকতক বিত্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল কোরআনে এখানে রহমতের অর্থ নবুওয়ত ও রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুওয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে, তোমরা আমার নবুওয়ত ও রিসালতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবী করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নবুওয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নবুওয়তের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুওয়ত দেবে না – কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত থানভী (রহঃ) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম দান। তফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুওয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন— أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ নবুওয়ত।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ
فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ
اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ
يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ
مَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا
الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ
وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ
لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ
لَا تُؤْمِنُوْا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ
يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ
خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ
سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

(১০১) আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বলল ঃ হে মূসা, আমার ধারণায় তুমি তো জাদুগ্রস্ত। (১০২) তিনি বললেন ঃ তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ। (১০৩) অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (১০৪) তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম ঃ এ দেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব। (১০৫) আমি সত্যসহ এ কোরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি কোরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বলুন ঃ তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে এলম প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বলে ঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (১০৯) তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়। (১১০) বলুন ঃ আল্লাহ্ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। (১১১) বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ এতে মূসা (আঃ)-কে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। اٰيَة শব্দটি মু'জেযা এবং কোরআনী আয়াত অর্থাৎ, আহকামে এলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। একদল তফসীরবিদ এখানে اٰيَة -এর অর্থ মু'জেযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় নয়ের বেশী না হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জেযা এভাবে গণনা করেছেন ঃ (১) মূসা (আঃ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, (২) শুভ্র হাত, যা জামার নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, (৩) মুখের তোতলামি — যা দূর করে দেয়া হয়েছিল, (৪) বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্যে নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেয়া, (৫) অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, (৬) তুফান প্রেরণ করা, (৭) শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং (৯) রক্তের আযাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।

يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا —তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কোরআন তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। (অর্থাৎ, দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব)। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। (এক) যে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে। (দুই) যে ইসলামী সীমান্তের হেফাযতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে।-(বায়হাকী, হাকেম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে সম্প্রদায়ে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন।—(রূহুল মা'আনী)

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (এক) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন দোআয় 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া রহমান' বলে আহবান করলে মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু'আল্লাহ্কে আহবান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে, যে আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু'উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা-কেবল দু'টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন নামাযে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং কোরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে উদ্দেশ করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা

বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বলত। সাবেয়ী ও অগ্নিপূজারীরা বলত যে, আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব যারা শক্তিলাভ করে সে কোন সময় নিজের চাইতে ছোট হয়। যেমন, সন্তান; কোন সময় নিজের সমতুল্য হয়। যেমন, অংশীদার এবং কোন সময় নিজের চাইতে বড় হয়। যেমন, সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নিজের জন্যে যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত আয়াতে নামাযে কোরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুব উচ্চৈঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলাবাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাযসমূহের জন্যে। যোহর ও আসরের নামাযে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'জেহরী' নামায বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামায বোঝায়। তাহাজ্জুদের নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবু বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত ওমরকে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে বললেন ঃ আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন ঃ যাঁকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা গোপনতম আওয়াযও শ্রবণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর হযরত ওমরকে বললেন ঃ আপনি এত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন ঃ আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেয়ার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে আদেশ দিলেন, যে অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। – (তিরমিযী)

নামাযের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত মাসআলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি এজাযতের আয়াত। – (আহমদ তাবরানী) এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও তসবীহ্ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্যে অপরিহার্য।–(মাযহারী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোন শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন ঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার এই দুর্দশা কেন? লোকটি আরয করল ঃ রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দেই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব–অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

–এর কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবার সেদিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরয করল ঃ যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি। – (মাযহারী)

সূরা বনী ইস্‌রাইল সমাপ্ত